Vol. 24 | No. 1 | 1980

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সাহিত্য পত্রিকার ঐতিহ্য-সাধনা : রবীন্দ্রালোচনা

Volume	24
Issue	1
Year	1980
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুহম্মদ মজিরউদ্দীন
Published online	December 1, 1980
DOI	10.62328/sp.v24i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v24i1.3
Pages	36-49
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকার ঐতিহ্য-সাধনা : রবীন্দ্রালোচনা

মুহম্মদ মজিরউদ্দীন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মুখপত্র 'সাহিত্য পত্রিকা' সাতচল্লিশোত্তর বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা-পত্র। ১৩৬৪ বঙ্গাব্দের বর্ষায় এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় বিভাগীয় অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই-এর সম্পাদনায়। 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং এদেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত'[১] প্রবন্ধ প্রকাশের উদ্দেশ্যেই পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম সংখ্যার সূচী[২] এবং রচনার চরিত্র লক্ষ্য করলেই পত্রিকার প্রকৃতি অনুধাবন করা যায়। শুধু গবেষণামূলক পত্রিকা প্রকাশই নয়, বস্তুত এ-কাল পর্যন্ত পাকিস্তানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণার ধারা গড়ে ওঠেনি। 'সাহিত্য পত্রিকা', এ-ক্ষেত্রে পথিকৃত। সমকালে প্রকাশিত 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা' একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মুখপত্র হলেও তার প্রথম খণ্ডের (জানুয়ারী ১৯৫৭) স্বভাব ও শরীরে গবেষণার তেমন ছাপ স্পষ্ট ছিল না বরং তা ছিল মূলত 'প্রবন্ধ পত্রিকা'।[৩] সুতরাং এদেশে গবেষণার ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠায় সাহিত্য পত্রিকার ভূমিকা গৌরবময়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রক্ষণ ও গবেষণায় বহুদিন পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগই ছিল একমাত্র প্রতিনিধি—এতদিন এ-বিভাগ তার গবেষণার ফল প্রকাশ করতে পারেনি অর্থনৈতিক অসুবিধায়। বিভাগীয় অধ্যক্ষ বিষয়টি তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব জহীরউদ্দীনের দৃষ্টিগোচর করেন। মন্ত্রীর সদিচ্ছায় যে অর্থ সাহায্য আসে তদ্বারা সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ ও বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সংক্রান্ত গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পত্রিকার প্রথম সংখ্যা দেশ বিদেশের সুধিবৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে। প্রসঙ্গত ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন : 'এই পত্রিকা নানা মৌলিক চিন্তাপ্রসূত রচনায় সমৃদ্ধ ও বাংলা সাহিত্যের অনেক দিকের প্রতি আলোকপাত করিয়াছে। ···ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ একখানি উপাদেয় পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা করিয়াছেন তাহার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলা বিভাগের অধ্যাপকমণ্ডলী সমেত বাংলা সাহিত্যানুরাগী ও বাংলা ভাষাভাষী কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে যে প্রচুর সাহিত্যের নিদর্শন এখনও অনাবিষ্কৃত আছে তাহার আবিষ্কার, পরিচয় দান ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় তাহাদের সার্থক প্রয়োগের দায়িত্ব এখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। এছাড়া বহু ভারতীয় এবং দেশীয় পণ্ডিত পত্রিকার সৌষ্ঠব, এর প্রবন্ধাবলীর মৌলিকতা ও গবেষণা নিষ্ঠার প্রতি মুগ্ধ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।[৪] ১৩৬৪ থেকে ১৩৭৫ (১৯৫৭–'৬৮) পর্যন্ত, ১২ বছর, অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই অতিদক্ষতার সঙ্গে সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করেন। ১৯৬৯-র ৩রা জুন তাঁর মৃত্যুর পর পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্ব অর্পিত হয় ডঃ আহমদ শরীফের উপর—তিনি যে চারটি সংখ্যা (১৩/১, ১৩/২, ১৪/১, ১৪/২) সম্পাদনা করেন তন্মধ্যে চতুর্দশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা ছাপাখানায় বিনষ্ট হয়ে যায়।[৫] বিনষ্ট সংখ্যা সম্পর্কে প্রফেসর কাজী আবদুল মান্নানের ভাষ্য হলো, এর একটি কপি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।[৬] মুক্তিযুদ্ধের কারণে ১৯৭১-৭২ সালে পত্রিকার পঞ্চদশ ও ষোড়শ

বর্ষের কোন সংখ্যা প্রকাশিত হয় নি। সপ্তদশ বর্ষ ১৩৮০ থেকে বিভাগীয় চেয়ারম্যান ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিমের সম্পাদনায় পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে—তাঁর সম্পাদনায় ১৭শ বর্ষ প্রথম (বর্ষা ১৩৮০), দ্বিতীয় (শীত ১৩৮০) ; ১৮শ বর্ষ প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। অতঃপর ১৩৮২, '৮৩, '৮৪ এই তিন বছর, ১৯ থেকে ২১ বর্ষ, অর্থাভাব ও নানাবিধ কারণে, সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ থাকে। ১৯৭৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং অতঃপর তাঁর সম্পাদনায়, সাহিত্য পত্রিকা নব পর্যায়ে প্রকাশিত হতে থাকে। দ্বাবিংশ বর্ষের প্রথম সংখ্যা (১৩৮৫ শীত) 'প্রসঙ্গ কথায়' সম্পাদক বলেছেন : 'তিন বছর বিরতির পর নব পর্যায়ে সাহিত্য পত্রিকা পুনরায় প্রকাশিত হল। এখন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ অর্থানুকূল্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসে সাহিত্য পত্রিকা মুদ্রিত হবে।'

সাহিত্য পত্রিকা পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হলেও পরে বাংলা একাডেমী এবং বাংলা উন্নয়ন বোর্ড তাকে অর্থ মঞ্জুরি দিয়েছিল। স্বাধীনতা উত্তর কালে নানা সংকট অতিক্রম করে, শেষ পর্যন্ত পত্রিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক সহযোগিতা লাভ করেছে। অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই-এর কালে পত্রিকা প্রকাশের নিয়মানুবর্তিতা, তার সুপুষ্ট কলেবর এবং উচ্চমান পাঠকের বিস্ময়-দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পরবর্তী কালে নানা কারণে পত্রিকা 'অনিয়মিত ও ক্ষীণকলেবর' হয়ে পড়ে। তবু অসংকোচে বলা চলে 'সাহিত্য পত্রিকা'র মান দেশের অন্যান্য গবেষণা পত্রিকার তুলনায় সর্বোচ্চে রাখবার ও পত্রিকার বহিরঙ্গে অন্তরঙ্গে একটি স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সযত্ন প্রয়াস বরাবর অক্ষুণ্ণ আছে।

. .

'সাহিত্য পত্রিকা'র ২৩ বছরের ইতিহাসে যে বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হলো আমাদের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির অতীতকে পুনরাবিষ্কার, বর্তমানকে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলা ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তোলার সাধনা অক্ষুন্ন, অব্যাহত আছে। পত্রিকা গবেষণার ঐতিহ্য যে সৃষ্টি করেছে তা নিঃসন্দেহে অসাধারণ।

. . .

'ঐতিহ্য' শব্দটির আভিধানিক অর্থ যা-ই হোক, সাহিত্যে তার উপযোগিতা গভীর তাৎপর্যবহ। সমালোচক বলেছেন :

. . .

> Tradition is a matter of much wider significance. It can not be inherited, and if you want it you must obtain it by great labour. It involves, in the first place, the historical sense which we may call, nearly indispensible to any one who would cantinue to be a poet beyond his twentfifth year, and the historical sense involves a perception not only of the pastness of the past but of its presence. .... This historical sense, which is a sense of the timeless as well as of the temporal and of the timeless and of the temporal together, is what makes a writer traditional. And it is of the same time what makes a writer most acutely conscious of his place in time of his own contemporaneity.৮

অর্থাৎ 'ঐতিহ্য' সহজলভ্য উত্তরাধিকার নয়, তা বিপুল পরিশ্রমে অর্জন করতে হয়। যে ঐতিহাসিক-চেতনা এর সংগে জড়িয়ে আছে তা কেবল অতীত-ধারণা নয়, বর্তমান প্রাসঙ্গিকও। এই ঐতিহাসিক বোধ দেশকালাতিশয়ী। আবার এও সত্য যে এ-ধারণা লেখককে তার স্বকাল এবং স্বদেশ সম্পর্কে তীব্র সচেতন করে তোলে— এই ইতিহাস বোধের দ্বারা, অতীত ও বর্তমানের চেতনা তাকে করে তোলে ঐতিহ্য-সচেতন।

এই তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে সাহিত্য পত্রিকার ঐতিহ্য সাধনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অতীত গৌরবকে আবিষ্কার ও তার চর্চায় এর ঐকান্তিক প্রয়াস অব্যাহত আছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন-প্রসঙ্গে তার অনুশীলন একান্ত মৌলিক। বহু অনাবিষ্কৃত দিক ও বিলুপ্তপ্রায় নিদর্শনের পরিচয় দান করে 'সাহিত্য পত্রিকা' আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে নতুন সত্য ও তথ্য সংযোজন করেছে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে সাহিত্য পত্রিকায় বেশ কতকগুলো মৌলিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র 'কানুপার কাল নির্ণয়' (শীত ১৩৬৫) প্রকৃত পক্ষে পূর্বসূরী সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করেছে। চর্যার প্রাচীনতা সম্পর্কে তাঁর অভিমত এখন নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য। এ ছাড়া তাঁর 'বৌদ্ধগানের ভাষা' (বর্ষা ১৩৬৪) 'চর্যাপদের পাঠ সমালোচনা' (শীত ১৩৭০); সৈয়দ মুর্তজা আলীর 'চর্যাপদের ভাষা' (শীত ১৩৭০) ডঃ নীলিমা ইব্রাহিমের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও বাংলা কাব্যে বৌদ্ধগান ও দোহার প্রভাব' (বর্ষা ১৩৭২) প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে খুবই স্মরণীয় রচনা। পরবর্তীকালে 'পাণ্ডুলিপি', 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা', 'ভাষা-সাহিত্য পত্র' ও 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা'য় এ সম্পর্কে যে ব্যাপক আলোচনা হয়েছে তার সূচনা করেছিল 'সাহিত্য পত্রিকা'।

ঐতিহ্য-সাধনা সাধারণ অর্থে গৌরবময় অতীতকে বর্তমানের পটভূমিতে অনুশীলন। মধ্যযুগের পুথি সাহিত্য আমাদের সাহিত্যের এক বিপুল সম্পদ। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে পুথি সংগ্রহ আরম্ভ হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান পুথি সংগ্রহ করতে থাকে। এই সব পুথির মধ্যে মুসলমান কবি রচিত অজস্র পুথি ছিল। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৬৯–১৯৫৩) ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কয়েক সহস্র পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। তিনি তাঁর সংগ্রহ থেকে ৫৯৭ খানা পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছিলেন। এর মধ্যে ৩০০ খানা পুথি মুসলিম কবি রচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি সংখ্যা ২০ হাজারের উপর। বাংলা সাহিত্যের এই সম্পদকে বর্ষা-বৃষ্টি লূতাতন্তুর কবল থেকে উদ্ধার করে পুথিশালায় স্তূপ করে রাখা হয়েছিল। সেগুলোর পাঠোদ্ধার, সম্পাদনা আলোচনা যথার্থভাবে আরম্ভ হয় 'সাহিত্য পত্রিকা'-র মাধ্যমে। পুথি সম্পাদনা, যৌগিক পাঠ নির্ণয়, কাল নির্ণয় ইত্যাদি প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুশীলন বাংলাদেশের সাহিত্য পত্রিকার মাধ্যমেই প্রথম আরম্ভ হয়। পত্রিকা পুথি প্রাসঙ্গিক গবেষণার দ্বারা মধ্যযুগীয় বাংলার জীবন, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাসের নানা উপাদানের পরিচয় এবং বিলুপ্তপ্রায় নিদর্শনের উজ্জীবনের সূত্রপাত করে। নিম্নোক্ত রচনাবলী মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বিরাট অনাবিষ্কৃত অধ্যায়কে আলোয় এনেছে :

আনিসুজ্জামান	:	শায়ের ফকির গরীবুল্লাহ্‌, বর্ষা ১৩৬৫
		সৈয়দ হামজা ও তাঁর কাব্য, শীত ১৩৬৫
আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ্‌	:	বাংলা সাহিত্যে উপাখ্যান—গুলে বকাওলী, শীত ১৩৬৪
আলী আহমদ	:	গোরক্ষ বিজয়ের কবি ফয়জুল্লাহ্‌র ভনিতা, শীত ১৩৬৮
আহমদ শরীফ	:	বিদ্যাসুন্দরের কবি দ্বিজশ্রীধর ও সাবিরিদ খান, বর্ষা ১৩৬৪
		তোহফা, শীত ১৩৬৪
		একটি প্রশস্তি কবিতা, শীত ১৩৭৩
		রসুল বিজয় (জয়েনউদ্দীন) সম্পাদিত, শীত ১৩৭০
		মোহাম্মদ খানের বংশ লতিকায় ইতিহাসের উপাদান, বর্ষা ১৩৮৬

		সত্যকলি বিবাদ সংবাদ, বর্ষা ১৩৬৬
		ব্রজমোহন দাস বিরচিত চৈতন্যতত্ত্ব প্রদীপ, শীত ১৩৮৫
ওয়াকিল আহমদ	:	বাংলা সুফী পদাবলী, শীত ১৩৭৭
কাজী দীন মোহাম্মদ	:	পদ্মাবতী কাব্যে আলাওল, বর্ষা ১৩৬৪
নীলিমা ইব্রাহিম	:	মুকুন্দরামের কাব্যে শ্রেণীচরিত্র, বর্ষা ১৩৮১
মুহম্মদ এনামুল হক	:	শাহ মুহম্মদ সগীরের ইউসুফ জলিখা, শীত ১৩৭১
		শেখ জাহেদ প্রণীত আদ্য-পরিচয়, বর্ষা ১৩৮৬

এছাড়া সৈয়দ আলী আহসানের 'জায়সী ও আলাওল' বিষয়ক ৫টি, পদুমাবত উপাখ্যানের উৎস (বর্ষা ১৩৭২) এবং 'মধুমালতী উপাখ্যান' (বর্ষা ১৩৭১) সাতটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই সব প্রবন্ধের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের বহু অজ্ঞাত এবং অপরিজ্ঞাত তথ্য উদঘাটিত হয়েছে ; শাহ মুহম্মদ সগীর থেকে কাজী হায়াৎ মামুদ পর্যন্ত সাহিত্য-ধারা ক্রমাগত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা-সাহিত্য-সংস্কৃতি, বাঙালির ধর্ম ও দর্শন চেতনা, সমাজ জীবনের পরিচয় ও ইতিহাসের নানা তথ্য উত্তরপুরুষদের জ্ঞান-সীমায় পৌঁচেছে।

বিগত ২৩ বছরে সাহিত্য পত্রিকার ৩২টি সংখ্যায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের (১৮০০-১৯৪৭; ১৯৪৭-১৯৭৯) বিষয়বস্তু নিয়ে মোট ৬২টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রসঙ্গ হিসাবে মুসলিম বিষয়ক ২১টি, হিন্দু ১৭টি, সামগ্রিক ১০টি এবং রবীন্দ্র ১৪টি। অন্যান্য প্রসঙ্গের চেয়ে ব্রিটিশ-যুগের বাংলা সাহিত্যের মুসলিম অবদান বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধের সংখ্যা আপাত দৃষ্টিতে বেশি—এদিক থেকে বলা চলে মুসলিম সংস্কৃতি ও ইতিহাসের আলোচনায় সাহিত্য পত্রিকার ভূমিকা বলিষ্ঠ। তবে স্বাতন্ত্র্যকামী প্রবণতার কোন প্রশ্রয় এখানে নেই, জাতীয় ভাষা সাহিত্যের সামগ্রিক সত্তার পরিচয় উন্মোচন তার সাধনার মৌল বৈশিষ্ট্য। সাহিত্য পত্রিকার দৃষ্টিতে সাহিত্য বড়, সম্প্রদায় নয় ; তাই ৬২টি নিবন্ধের মধ্যে ৪১টি অমুসলিম বিষয়ক হতে পেরেছে। বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ ইত্যাদি পাকিস্তান আমলে সরকারী সাহায্য-পুষ্ট পত্রিকার বিষয়বস্তু হওয়া সহজ কথা ছিল না।

সাতচল্লিশোত্তর বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যতত্ত্ব ও ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনায় 'সাহিত্য পত্রিকা' পথিকৃৎ। এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত অজিত কুমার গুহের 'রূপ প্রতীকের ধারা' সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রথম উল্লেখযোগ্য নিবন্ধ। মুনীর চৌধুরী কৃত তুলনামূলক সমালোচনা সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার অঙ্গনে আচার্য সুনীতিকুমার এবং ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র পর যিনি বিশেষভাবে স্মরণীয় সেই প্রফেসর মুহম্মদ আবদুল হাই-য়ের বর্ণনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার ফল সাহিত্য পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকায় এ যাবৎ ভাষাতত্ত্ব সংক্রান্ত মোট ১৮টি মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের আলোচনা এবং জরিপভিত্তিক ফলিত গবেষণা নিবন্ধও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ধ্বনিগুণ, ধ্বনিতরঙ্গ, বাক্‌-প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি তাত্ত্বিক আলোচনা এবং 'বাংলা লিপি ও বানান সমস্যা' (শীত ১৩৬৮), 'ঢাকাই উপভাষা' (বর্ষা ১৩৭২), 'বাংলা ধ্বনিপ্রবাহ', 'বাংলার ব্যঞ্জনধ্বনি' শীর্ষক প্রবন্ধগুলো ব্যাপক গবেষণার ফল। সাহিত্য পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার যে সূত্রপাত হয়েছিল তা পরবর্তীকালে অব্যাহত সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে।

সাহিত্য পত্রিকা অধ্যাপক এবং গবেষকদের মধ্যে ভাষা সাহিত্য, দর্শন, ছন্দ-সঙ্গীত, লোক-সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে গবেষণার দিগন্ত উন্মোচন করেছে। এবং 'সাহিত্যের

জ্ঞানবৃত্তির অনুশীলনের মাধ্যমে দেশের মানুষকে সাহিত্যের ঐতিহ্যে সঞ্জীবিত করে তোলা'র সাধনা করেছে। রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনা এই অনুশীলনের একটি বড় অংশ।

ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে দেশ বিভাগের পর সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উষ্ণতা জিইয়ে রাখা হয়েছিল। এক শ্রেণীর শিক্ষিত লোক ঢাকায় সাহিত্য সংস্কৃতিচর্চার যে পরিবেশ গড়ে তুলেছিলেন তা ছিল স্বাতন্ত্র্যকামী—মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী এই ধারা পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ, তমদ্দুন মযলিশ এবং পূর্বপাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি প্রভৃতির কার্যক্রমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমান-দের স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টির প্রয়াস চলেছিল—পাক হুকুমাতে 'আল্লাহ্‌র দেওয়া বিশ্ব বিধান ইসলামী শরীয়ত' কায়েম করবার জন্য এক দল কবি সাহিত্যিক শপথ নিলেন। আরম্ভ হলো হিন্দু বিরোধিতা, বাংলা বিরোধিতা, নজরুলের কবিতার সংস্কার, রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করবার ষড়যন্ত্র। ১৯৫১ থেকে '৬১-র দশকে দুই বিরোধী মনোভাব ক্রমাগত স্পষ্ট হতে থাকে। দীর্ঘদিন যে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী বাংলা ভাষা সাহিত্য ও রবীন্দ্র বিরোধিতা করছিল প্রায় অবাধে, তারা ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে প্রতি-রোধের সম্মুখীন হলো। সব প্রতিকূলতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ক্রমাগত জীবন্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। সমালোচক বলেছেন :

> শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত পূর্ববঙ্গে সাধারণের মধ্যে সর্বপ্রথম একটি জীবন্ত সত্তায় পরিণত হল। এই উৎসব উপলক্ষে একদিকে প্রদেশব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বৃহত্তর একটি পরিমণ্ডলের কাছে পরিচিত এবং ক্ষেত্রবিশেষে জনপ্রিয় হন।[১০]

১৯৬০-৬১ সালে রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক ও অসাম্প্রদায়িকদের মধ্যে যখন বিতর্ক চরমে উঠেছিল তখন আজন্ম রবীন্দ্র সাহিত্যানুরাগী প্রফেসর হাই রবীন্দ্র-পক্ষে বলিষ্ঠ বক্তব্য উপস্থিত করলেন। বিভিন্ন স্থানে জয়ন্তী অনুষ্ঠানে তিনি রবীন্দ্র সাহিত্যের সার্বজনীনতা ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমানবতার[১১] সুর ব্যাখ্যা করেন এবং উদার দৃষ্টিতে রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।[১২] তাঁর নেতৃত্বে ১৯৬৩ সালে 'ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০' উদযাপন করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের বাংলা বিভাগ রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নাটকের প্রতি যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে তাতে প্রতিক্রিয়াশীল মহল আরো শঙ্কিত হয় এবং সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব উপলব্ধি করে। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে তৎকালীন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শাহাবুদ্দীন প্রচার মাধ্যম থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্জনের প্রস্তাব করলে পূর্বপাকিস্তানে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক অধ্যক্ষ আবদুল হাই যে প্রতিবাদে স্বাক্ষর দান করেছিলেন তার একাংশ ছিল :

> The enrichment Tagore brought to Bengali language by his literary creation, the refinement his songs brought to our sensibility, make him an integral part of the cultural existence of the Bengali speaking Pakistanis.[১৩]

এ বছরের রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে সভাপতির ভাষণে প্রফেসর হাই বলেছিলেন :

> ...the genus of Tagore was above all narrowness, insularity and religious fanaticism. Those who accused him an Anti-Muslim could do so out of ignorance of the man.[১৪]

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পাঠ্যসূচী থেকে সকল হিন্দু সাহিত্যিক এবং রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করবার জন্য সরকার তাঁর উপর চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। কিন্তু তিনি সে চাপ উপেক্ষা করেন। তিনি মনে করতেন 'রবীন্দ্রনাথকে বিসর্জন দেওয়া মানে আমার জীবনের কথা, ভালবাসা, প্রেম সব কিছুকে বাদ দেওয়া, আমি পারবো না'।[১৫] এসব কথা, ভাষণ, বিবৃতি এবং কাব্য প্রেমের উচ্ছ্বাসময় বক্তব্যে প্রফেসর হাই-য়ের রবীন্দ্রপ্রীতি শেষ হয়নি—রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনা, অনুশীলন ও গবেষণায় তিনি চরম শক্তি নিয়োগ করেছিলেন ; এ ক্ষেত্রে সাহিত্য পত্রিকা ছিল তাঁর প্রধান হাতিয়ার।

১৯৬০ সালে সাহিত্য পত্রিকায় রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়—এটি হলো শিশিরকুমার ঘোষ রচিত 'রবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্য'।[১৬] প্রবন্ধটি দীর্ঘ এবং গবেষণানির্ভর রবীন্দ্রকাব্যের গোধূলিপর্ব সম্পর্কে এমন ব্যাপক, তুলনামূলক এবং সূক্ষ্ম সমালোচনা বিরল। লেখক কাব্যের ইতি ও নেতি উভয় প্রসঙ্গে নিরাবেগ আলোচনা করে বলেছেন :

> শুদ্ধ বিচারে, হয়তো কাব্যের চেয়ে বিবৃতি হিসাবে তাদের মূল্য বেশী, এবং সামাজিক পরিবেশের চেয়েও কবির পরিস্থিতিকেই যেন তারা অধিকতর স্পষ্ট করে তোলে। লেখাগুলির অসামান্যতা কেউই অস্বীকার করবেন না, তাদের কয়েকটি তো বারংবার উদ্ধৃত হয়ে থাকে, কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগের চাইতে বিচ্ছিন্নতাই এদের মধ্যে ফুটে উঠেছে বেশি করে। বিশ্ব বিক্ষোভে কবির ভূমিকা দর্শকের, সক্রিয় কর্মীর নয়। ভবিষ্যতের কবি "কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা" অর্জন করবেন তিনি সেই আশা করেছেন, নিজেকে সেই কবির আসনে বসাতে চান নি।[১৭]

অন্তর্মুখীন রবীন্দ্রনাথের সুরক্ষিত ভাবরাজ্যে সামাজিক বা রাজনৈতিক ঘটনার প্রবেশ অনধিকার চর্চা। ত্রাণকর্তায় বিশ্বাস তাঁর সমগ্র সত্তায় জড়িয়ে আছে। অথচ 'যারা কাজ করে', তাদের কথা তিনি ভুলতে পারেন না কিন্তু তাদের সঙ্গে তাঁর সহযোগ কতটুকু? এই দ্বন্দ্বকে শ্রীঘোষ বলেছেন : 'একটি বেদনার কারণ অন্যটি বেদনার ধন।' রবীন্দ্রপ্রতিভাকে কোন একটি তত্ত্বের সাহায্যে বোঝানো যায় না—'যেমন ধর্ম সাধনায় তেমনি কাব্য সাধনায় তিনি আমাদের অদ্বিতীয় ecletic[১৮]। তাঁর উত্তর সম্পর্কে লেখক কিছু কঠিন কথাও বলেছেন কিন্তু নেতিবাচক বক্তব্য উচ্চারণ করতে গিয়ে সমালোচক বারংবার হোঁচট খেয়ে ফিরে এসেছেন। তিনি মনে করেন র‍্যাঁবো, মালার্মে, রিলকে, এলিয়ট যেভাবে একটি বিশেষ ঢং বা প্রকৌশল গড়ে তুলেছেন রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি ; "কিন্তু রবীন্দ্র-মানসে ধ্রুপদী আদর্শের প্রাধান্য ও ভাষার শুদ্ধীকরণ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথকে কোনো একটি বিশেষ গোষ্ঠী বা ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেখা বা রবীন্দ্র-ঐতিহ্য বলে কোনো কিছু সৃষ্টি করা সহজ নয়।[১৯]

প্রাক-ষাটে বাংলাদেশে রবীন্দ্রালোচনা তেমন হয় নি, যা হয়েছে তার বিশেষত্ব হলো পরস্পর বিরোধী দুই দলের মধ্যে বিতর্ক। পঞ্চাশের দশকে 'অগত্যা'-য় প্রকাশিত (১৯৪৯) ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র 'পৃথিবীর কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' স্বভাবে অসাম্প্রদায়িক। এ ধরনের বিরল ব্যতিক্রম ছাড়াও 'দেশ বিভাগের এক দশক পরেও পূর্ব বঙ্গের মুসলিম সমাজে না রবীন্দ্র চর্চার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, না রবীন্দ্রসমালোচনার মান উন্নত হয়েছে।'[২০] সাহিত্য পত্রিকা ষাট থেকেই এক্ষেত্রে গ্রহণ করেছে শক্তিশালী পদক্ষেপ। পত্রিকা রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী স্মরণ রেখে ১৩৬৮-র বর্ষা সংখ্যায় সন্নিবেশিত করেছে :

১. রবীন্দ্রনাথের ছড়ারসংগ্রহ : ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য,

২. ইয়েটস্ ও রবীন্দ্রনাথ : ড. সারওয়ার মুরশিদ

৩. ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ : মুহম্মদ আবদুল হাই।

ডক্টর ভট্টাচার্য তাঁর নিবন্ধের প্রথমাংশে এদেশে ছড়া প্রবাদ সংগ্রহের ইতিহাস বর্ণনা করে দেখিয়েছেন যে, এক্ষেত্রে সর্বপ্রাচীন সংগ্রাহক উইলিয়ম মর্টন—তাঁর বাংলা প্রবাদ সংগ্রহ প্রকাশের (১৮৩২) পর জেমস্ লঙ্-এর 'প্রবাদ মালা' ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে; ২য়, ৩য় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৭২ এর মধ্যে। অতঃপর জর্জ গ্রীয়ার্সনের 'মানিক রাজার গান' (১৮৭৩) ও লাল বিহারীদের Folk tales of Bengal প্রকাশিত হলে বাংলালোক-সাহিত্যের প্রতি দেশী-বিদেশী সুধিবৃন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। লোকসাহিত্যের আলোচনামূলক প্রথম আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রবন্ধ রবীন্দ্রনাথের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। রচনাটি সম্পর্কে ডক্টর ভট্টাচার্য গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন:

> ইহা কেবলমাত্র ছড়ারসংগ্রহ নহে—তাহার রস বিশ্লেষণ। ইতিপূর্বে বাংলাতেই হউক কিংবা ইংরেজিতেই হউক বাংলা লোক-সাহিত্যের যে সকল সংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছিল, সংগ্রহ ব্যতীত তাহাদের আর কোন মূল্য ছিল না।[২১]

রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ বাংলার লোক-সাহিত্যানুরাগী ও সংগ্রাহকদের সামনে উন্মোচন করলো এক নতুন রস-জগৎ—এ রচনা প্রকাশের দশ বছরের মধ্যে আমাদের সাহিত্যে নবযুগ ও নবচেতনার সঞ্চার হয়। ডক্টর ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন:

> রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ প্রকাশের দশ বৎসরের মধ্যে কলিকাতা ও মফস্বলের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লোকসাহিত্যের বিভিন্ন উপকরণ সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইল। সেদিন যদি বাঙালি বিদগ্ধ সমাজের মধ্যে এই প্রেরণা দেখা না দিত, তবে আজ এই বিপর্যস্ত বাঙালি সমাজজীবনের লোকসাহিত্যের কোন উপকরণই আর অবশিষ্ট থাকিত না।
>
> রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ প্রকাশের প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ কয়েকজন বিশিষ্ট লোক-সাহিত্য সংগ্রাহক বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সংগ্রহ করিয়া পরবর্তী কয়েক সংখ্যা ধরিয়া সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় যে ক্রমানুয়ে তাদের সংগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে মুন্সী আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ ও বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২২]

কবি রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য নানাভাবে কাজ করেছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধ বাংলা সাহিত্যকে অসীম ঋণে আবদ্ধ করেছে। লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি এক মূর্তিমান প্রেরণা। রবীন্দ্রসাহিত্যের ধারায় সমালোচক লক্ষ্য করেছেন: গল্পগুচ্ছের 'ঘাটের কথা' বা কড়ি ও কোমলের 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' কবিতার মধ্য দিয়ে বাংলার লোকসাহিত্যের প্রতি কবির অনুরাগ সূচিত হয়েছে। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারতী পত্রিকায় ছড়া সংগ্রহের আবেদন প্রচার করেছিলেন। কবির শিলাইদহ আগমন ও মানসী-সোনার তরী–চিত্রা-গল্পগুচ্ছের পটভূমিতে লোক-সাহিত্যানুরাগের চিহ্ন উজ্জল:

> রবীন্দ্রনাথের ছড়ার সংগ্রহ ও বিচার তাঁহার প্রতিভার মধ্যাহ্ন দীপ্তির অন্তর্ভুক্ত, ইহা তাঁহার প্রতিভার ক্ষীয়মান যুগের অর্থহীন কল্পনা বিলাস মাত্র নহে। দ্বিতীয়ত

পূর্ব বাংলার পল্লীজীবনের মধ্যে আসিয়াই তিনি সেদিন জীবন ও প্রকৃতির নিতান্ত নিকটবর্তী হইয়া ইহাদের শক্তি ও প্রভাব অনুভব করিয়াছিলেন। সেই জন্য সেই যুগে ইহারা যেমন সংগৃহীত হইয়াছে, তেমনি সেই যুগেই ইহা তাঁহার রস বিচারের মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে।২৩

বাংলার মাটি ও মানুষের সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্যের এই নিগূঢ় সম্পর্ক বিশ্লেষণে ডক্টর ভট্টাচার্যের দক্ষতা প্রশংসনীয় এবং সাহিত্য পত্রিকায় এ প্রবন্ধ প্রকাশ অবশ্যই এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।

সারওয়ার মুরশিদের প্রবন্ধ 'ইয়েটস্ ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ' তুলনামূলক আলোচনার একটি চমৎকার নিদর্শন। নানা সূত্রে জানা যায় এক কালে রবীন্দ্রনাথের প্রতি ইয়েটস্-এর বিশেষ অনুরাগ থাকলেও তাঁর শেষ বয়সে সে অনুরাগ প্রায় বিলুপ্ত হয়েছিল—ডক্টর মুরশিদ বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার দ্বারা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ ও প্রাচ্য চিন্তার কোন-কোন দিকের প্রতি ইয়েটস্-এর আকর্ষণ না থাকলেও তাঁর কাছে রবীন্দ্র-নাথের মূল্য শেষ পর্যন্ত অম্লান ছিল। এবং 'যখন ইয়েটস্ রবীন্দ্রনাথের চিন্তা সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন তার কাছাকাছি সময় তাঁর একটি কবিতায় প্রায় রাবীন্দ্রিক অনুভূতি ও চিন্তার আকস্মিক ও বিস্ময়কর উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। প্রথম মহাযুদ্ধকালে ইয়োরোপীয় সংস্কৃতি যখন প্রবল সংকটের মুখোমুখী তখন "অপেক্ষাকৃত সরল অথচ গভীর সংস্কৃতির মর্মস্পর্শী বাণী নিয়ে এলেন রবীন্দ্রনাথ। সংশয়দীর্ণ ও হৃতপ্রত্যয় য়ুরোপীয় চিত্ত তাঁর আনন্দিত উপলব্ধি ও গভীর বিশ্বাসে মুগ্ধ হল।"২৪ সুতরাং রবীন্দ্রনাথ শুধু আমাদের নয় বিশ্ব সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। য়ুরোপীয় ঐতিহ্যে উগ্র বিশ্বাসী ইয়েটস্ আত্মরক্ষার তাগিদে জীবনের এশীয়রূপের প্রতি শঙ্কিত হয়ে যে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছেন সেই সাধারণ ধারণাই তাঁর রবীন্দ্রচেতনার বিশেষত্ব। ডক্টর মুরশিদের অনুসন্ধান থেকে স্পষ্টই মনে হয় রবীন্দ্র-নাথ বিশ্বসাহিত্যের গৌরবময় ঐতিহ্য।

মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর 'ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে কবির ভাষাতাত্ত্বিক সত্তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। তিনি বলেছেন: 'বিস্ময়ের বিষয় এই যে যাকে আমরা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং বাংলা ভাষার অবিসংবাদিত শ্রেষ্ঠ কবি বলে জানি সেই কবি রবীন্দ্রনাথই বাংলা ভাষার বর্ণনাভিত্তিক আলোচনার জনক এবং পথিকৃৎ হয়ে রয়েছেন।২৫

ভাষাবিজ্ঞানের বর্ণনা ভিত্তিক আলোচনা বিজ্ঞান নির্ভর সাধনা। রবীন্দ্রনাথের শব্দতত্ত্ব (১৯০৯) এবং বাংলা ভাষা পরিচয় (১৯৩৮) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে বিস্ময়কর অবদান। 'সাহিত্যিক প্রয়োজনে বাংলা ভাষা নিয়ে সাধনা করতে গিয়ে প্রখর মনীষা এবং গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে এ ভাষার যে নিগূঢ় পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন এবং প্রতিদিনের ব্যব-হারে এ-ভাষার রূপ তাঁর কাছে যে-ভাবে খুলে গিয়েছিল তিনি তারই সহজ ও স্বাভাবিক বিবৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন এ গ্রন্থ দুটিতে।২৬ নিপুণ ভাষাবিজ্ঞানীর মত রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থে—বাংলা স্বরধ্বনির পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করেছেন। রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বের নানা সমস্যা—উচ্চারণ, বহুবচন, সম্বন্ধে-কার, কৃৎ-তদ্ধিৎ, উপসর্গ, কর্ম ও সম্প্রদান কারক সম্পর্কে কবি চিত্তাকর্ষক আলোচনা করেছেন।

'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থে কবি বলেছেন যে, 'বাংলা ভাষা পরিচয় তত্ত্বের পরিচয় নিয়ে নয়, রূপের পরিচয় নিয়ে।' খাঁটি বাংলা ভাষার 'নিরলংকার ও টুকিটাকি শব্দ ও

শব্দ কণিকার পেছনে যে কি ব্যঞ্জনা নিহিত আছে রবীন্দ্রনাথ জহুরীর মতো তার পরিচয় দিয়েছেন'। ভাষা শিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়, পৃথিবীর অন্যান্য ভাষাতেও তাঁর মত প্রতিভা বিরল এবং এত দীর্ঘকাল ভাষা নিয়ে সাধনার উদাহরণও সহজলভ্য নয়—রবীন্দ্র প্রতিভার এই বিশেষ দিকটি বর্তমান নিবন্ধে চমৎকার-ভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

আলোচ্য তিনটি প্রবন্ধ ছাড়াও পত্রিকার এই সংখ্যায় একটি ঐতিহাসিক ছবি মুদ্রিত হয়েছে। ১৯৩৮ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় ছাত্রশিক্ষকসহ রবীন্দ্রনাথের এই ছবিটি তোলা হয়েছিল। উপস্থিতদের মধ্যে মুহম্মদ আবদুল হাই তখন ছাত্র ছিলেন। জন্মশতবার্ষিকীর পর প্রায় অর্ধযুগ সাহিত্য পত্রিকায় রবীন্দ্র-বিষয়ক আর কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নি। কালের শাসনই কি তার মুখ্য কারণ? অতঃপর ১৯৬৭ সালে, একাদশ বর্ষ, বর্ষা সংখ্যায়, হরেন্দ্রচন্দ্র পালের 'রবীন্দ্র সাহিত্যে রহস্যবাদ' শীর্ষক নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়। ডক্টর পাল তাঁর নিবন্ধের মুখভাগেই, রবীন্দ্র-বক্তব্য উদ্ধৃত করে আধ্যাত্মিকতার ব্যাখ্যা দিয়ে রহস্যবাদ সম্পর্কে বলেছেন :

> সকল শ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিকই এই রহস্যবাদ 'সেই আত্মতত্ত্ব বা (mysticism)-এর প্রকাশ তাঁহাদের সুরের ঝঙ্কারে বা তন্ময়তার বাণীরূপের মাধ্যমে আমাদের নিকট বিবৃত করিয়াছেন। সেই অধ্যাত্মসাধক তত্ত্ববিজ্ঞানী দার্শনিক ও রহস্যবাদের প্রকাশক বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথও তাঁহার অমর সাহিত্যে সর্ব জীবন ব্যাপিয়া নদীর স্রোতের ন্যায় আমাদের মরুতৃষা প্রাণ-তটে নানা ছন্দ, রূপ ও গানে,—কত অপরূপ ভঙ্গিতে, সেই তত্ত্ব কথা গাহিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়'।[২৭]

রবীন্দ্রকাব্যে অধ্যাত্মচেতনায় যে নিবিড় পরিচয় আছে তা ডক্টর পালের মতে সুফী কবিদের ভগবৎ-চেতনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরী ভাবনা ও রুমীর মসনবীতে একই অরূপরতনের পরিচয় আছে। মানসীর 'প্রিয়ে' আর মসনবীর 'বধূ' মূলত একই সত্তা। রবীন্দ্রনাথের ভাবাদর্শ যে ইসলাম পরিপন্থী নয় তা যেমন বর্তমান প্রবন্ধ থেকে তেমনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বহু প্রগতিশীল মনীষীরউক্তি থেকেই উপলব্ধি করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'তুমি'-তত্ত্ব ডক্টর পালের মতে 'কোন বিশেষ দেশ বা কালের নহে—ইহা সর্বদেশ ও সর্বকালের বাণী'। এই একই চিন্তাধারা সর্বকালের সাধক সন্ত বা সূফী কবিগণ দেশে দেশে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।' বিশ্বকবির আধ্যাত্মিক জীবন দর্শন যেমন উপনিষদের সঙ্গে তেমনি সেণ্ট লুথারের ভাবের সঙ্গে, তেমনি রুমীর চেতনার সঙ্গে এবং প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক ভারতীয়, ঈরানীয় এবং ইয়োরোপীয় ভাব-সাধনার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই রবীন্দ্রসাহিত্য হয়ে উঠেছে সার্বজনীন কল্যাণ ও সৌন্দর্য সাধনার গৌরবময় ঐতিহ্য।

১৩৭৫ সালের শীত সংখ্যা সাহিত্য পত্রিকায় সৈয়দ আকরম হোসেন রচিত 'রবীন্দ্র-নাথের উপন্যাস : দেশকাল ও শিল্পরূপ' প্রকাশিত হয়। এম. এ. পরীক্ষার থিসিস-পত্র হিসেবে নিবন্ধটি রচিত হয়। পরে এটি গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়েছে। নিবন্ধটির সাফল্য সম্পর্কে যে মতামতই থাক, এর মূল্য অবশ্যি স্বীকার্য—সমকালীন পূর্ব পাকিস্তানে রবীন্দ্র-আলোচনার প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য ছিল রবীন্দ্রনাথ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্রয়োজন কি না এবং তৎকালীন রাষ্ট্রীয় আদর্শ ও ধর্মীয় বোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না। আকরম হোসেন এ সব প্রশ্নের ধারে কাছে যান নি। তাঁর আলোচনা শিক্ষামূলক, সাহিত্য-সচেতন আদর্শ-প্রাণিত। প্রয়োজন অপ্রয়োজনের বিতর্ক তাঁর কর্মসীমার বাইরে

থেকে গেছে। এদিক থেকে রবীন্দ্রসাহিত্যের উদ্দেশ্যহীন আলোচনা ও শিল্পসঙ্গত সাহিত্যসমালোচনার ঐতিহ্যনির্মাণে প্রবন্ধটির মূল্য স্মরণযোগ্য।

আকরম হোসেনের রচনার মধ্যে ইতিহাসবোধ জাগ্রত আছে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস প্রসঙ্গে তিনি বিপুল দেশকালের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন। অজস্র তথ্য সংগ্রহ ও সন্নিবেশ করে তিনি প্রমাণ করেছেন যে তথ্য সংগ্রহ গবেষণা নয়, তার যথার্থ বিশ্লেষণ ও প্রয়োগই গবেষণা। তদানীন্তনকাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে যে-সব গবেষণা হয়েছিল তার বিষয়বস্তু কূপমণ্ডুক এবং জীবন-বিরহিত ছিল—সামাজিক প্রেক্ষাপট ও মূল্যবোধের চেয়ে ধর্মীয়-রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল মুখ্য—এই পটভূমিতে আকরম হোসেনের নিবন্ধটি ব্যতিক্রম।

বাংলা উপন্যাসসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক রবীন্দ্র-উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য নিরূপণে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। সমাজসংঘাতের ফলে যে ভাব-সংঘাত সৃষ্টি হয় তাই সাহিত্যে গতিবেগ সৃষ্টি করে বলে লেখক বিশ্বাস করেন এবং এ-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা-সাহিত্যে প্রথম মধ্যবিত্তসমাজের জীবনজটিলতা, আত্মবিক্ষোভ, মানসদ্বন্দ্ব, ভাবসংঘাতকে কেবল ঘটনাংশে রূপায়িত করলেন না; বরং মনের তলাশ্রয়ী ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার আবর্ত ও তার পরিণতির গুরুত্বকেও বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে প্রকাশ করলেন।[২৮]

রবীন্দ্র-উপন্যাসের শিল্পরূপ আলোচনা প্রসঙ্গেও আকরম হোসেন মৌলিক বক্তব্য পেশ করেছেন। বুদ্ধদেব বসু যেখানে রবীন্দ্রনাথকে কবি বলেই তাঁর উপন্যাস শিল্পের দুর্বলতার অভিযোগ এনেছেন; আকরম হোসেন সেখানে বলেছেন 'রবীন্দ্রনাথ কবি বলেই ঔপন্যাসিকদৃষ্টিতে তিনি যুগাতিক্রমী প্রবর্তনা পেয়েছিলেন। কবিত্বসূত্রে হৃদয়িক মূল্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের জন্মদাতা তিনি'।[২৯]

আকরম হোসেন তাঁর আলোচনার ভূমিকাতে রবীন্দ্র-উপন্যাসের সামগ্রিক আলোচনার দাবি করেছেন। এ দাবি অ-যথার্থ নয়, কারণ বাংলাদেশে তো নয়ই, এমন কি পশ্চিম বঙ্গেও সেদিন পর্যন্ত রবীন্দ্র-উপন্যাসের সামগ্রিক আলোচনা হয় নি। তাঁর আলোচনার ৫ বছর পর রচিত ডক্টর সত্যব্রত দে-র 'রবীন্দ্র-উপন্যাস সমীক্ষা' গ্রন্থের (১৯৭১) মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচকদের যে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন, তরুণ আকরম হোসেন সে আক্রমণকে চরম অসার প্রমাণ করেছেন।

আহমদ কবির 'রবীন্দ্রকাব্যে উপমা রূপক ও প্রতীক' শীর্ষক একটি গবেষণা নিবন্ধ প্রণয়ন করেন ১৩৭৬ সালে এম. এ. থিসিস হিসেবে। নিবন্ধটি সাহিত্য পত্রিকায় এ বছর বর্ষা ও শীত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৩৮১ সালে রচনাটি 'রবীন্দ্রকাব্য : উপমা ও প্রতীক' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সাহিত্য পত্রিকা রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রকরণ-গত দিক নিয়ে এদেশে এই প্রথম আলোচনা প্রকাশ করে। লেখক পত্রিকায় দাবি করেছেন : 'রবীন্দ্রনাথের উপমা সম্বন্ধে বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা অনেক কথা বলেছেন, অনেক বৈশিষ্ট্য তারা দেখিয়েছেন, কিন্তু কোন একটি আলোচনা আমরা পাই না যাতে রবীন্দ্র-উপমার ক্রমবিকাশ দেখানো হয়েছে, কিংবা তাঁর উপমা বৈশিষ্ট্যের সব দিকগুলো সূত্রাকারে গ্রথিত হয়েছে। বর্তমান গবেষণা প্রবন্ধে রবীন্দ্র-উপমা বিশ্লেষণে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে'।[৩০] এমন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ, কাব্যের নির্মাণকলা প্রাসঙ্গিক রচনা, শুধু রবীন্দ্র-সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রেই নয় সামগ্রিকভাবে সাহিত্যতত্ত্ব বা সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে সবিশেষ কল্যাণপ্রদ।

এতকাল বাংলাদেশে যে রবীন্দ্র-বিতর্ক চলছিল স্বাধীনতা লাভের পর কার্যত তার অবসান ঘটে। রবীন্দ্রসাহিত্য আলোচনার এক নবতর পর্যায় সৃষ্টি হয়। বহু পত্রিকায় রবীন্দ্রবিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হতে থাকে নতুন উল্লাসে। বাংলা একাডেমী পত্রিকাও এতদিনে তার চিরাচরিত ধারা পরিবর্তন করে। সাহিত্য পত্রিকা আপন পথে আরও স্বনিষ্ঠ হয়। এর মধ্যে অলক্ষ্যে আরও একটি পরিবর্তন ঘটলো—প্রফেসর হাই-য়ের সম্পাদনাকালে রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক যে ছয়টি প্রবন্ধ এ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তার অর্ধেকই ভারতীয় লেখকদের রচিত, উত্তরকালে প্রকাশিত আটটি প্রবন্ধের মধ্যে মাত্র একটি (অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য : রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বঙ্গদর্শন) ভারতীয় লেখকদের। অর্থাৎ স্বাধীনতা উত্তরকালে এদেশে রবীন্দ্রালোচনা মুক্তি লাভ করেছে।

ডক্টর নীলিমা ইব্রাহিম সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে : ১. মাহমুদা খাতুনের 'রবীন্দ্রনাথের কৌতুক নাটক' (১৭/২, শীত ১৩৮০), ২. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের 'রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বঙ্গদর্শন' (ঐ), ৩. আবু জাফরের 'রবীন্দ্রনাথের সাম্যবাদী চিন্তার স্বরূপ ও তাঁর কালের যাত্রা' (১৮/১)।

মাহমুদা খাতুন তাঁর প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের কৌতুক নাটকগুলোর ব্যাপক আলোচনা করেছেন। হাস্য কৌতুক, ব্যঙ্গ কৌতুক, প্রহসন ইত্যাদি পর্যায়ে তিনি কবির দক্ষতা এবং ত্রুটি-বিচ্যুতির বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা করেছেন। তিনি রচনাগুলোর শিল্প বিচার করেছেন এবং প্রাসঙ্গিক দেশকালের পরিচয় দিয়েছেন। কবির কৌতুক নাটকের বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করতে গিয়ে লেখিকা বলেছেন : রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুকে শুধু আনন্দ দেবার প্রয়াস নেই, 'শ্লেষ ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজ জীবনের ভ্রান্তি, মূঢ়তা ও গোঁড়ামিকে আঘাত করার চেষ্টাও লক্ষিত হয়। সে জন্য শুধু নির্মল হাস্যরস ছাড়াও হাস্য-কৌতুকের রচনা গুলির পটভূমিতে তৎকালীন শিক্ষিত সমাজ-মানসের বৃহত্তর পরিচয় বর্তমান'।[৩১] এই বৃহত্তর পরিচয়টি লেখিকা নাটকের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে, কালের ধর্ম, সমাজ, সাংস্কৃতিক ঘটনাবলীর ঐতিহাসিক প্রমাণ দিয়ে উপস্থাপিত করেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রায় অনালোচিত এই দিকটির প্রতি মাহমুদা খাতুন প্রশংসনীয় আলোকসম্পাৎ করেছেন।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের উল্লিখিত নিবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনের (১৩০৮-১২) এর পরিচয়। গবেষকদের জন্য লেখক প্রচুর উপাদান সরবরাহ করেছেন। আলোচ্য বছরগুলোতে বঙ্গদর্শনের যে ৬০টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল বর্তমান প্রবন্ধ মূলত তারই সূচী-সংকলন, তবে তা রবীন্দ্রজীবনের একটি বিশেষ কালের কর্মধারা ও মানসিক-তার পরিচয় বহন করেছে। পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে কবির দক্ষতা এবং এষণার পরিচয় ও অমিত্রসূদনের বক্তব্য এবং পরিবেশিত তথ্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠে। সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদিকা তাঁর সম্পাদকীয় নিবন্ধে রচনাটি সম্পর্কে বলেছেন : লেখাটি 'সাহিত্য প্রেমিক গবেষকদের কৌতূহলউদ্দীপনে সাহায্য করবে'।

আবু জাফর প্রণীত 'রবীন্দ্রনাথের সাম্যবাদী চিন্তার স্বরূপ ও তাঁর কালের যাত্রা' রবীন্দ্র-চিন্তার একটি বিশেষ ক্ষেত্রে আলোক সম্পাতের প্রয়াস। 'কালের যাত্রা' প্রসঙ্গে লেখক যে বক্তব্য উপস্থিত করেছেন তা ভিন্ন-প্রসঙ্গে বহু আলোচিত। ১৯৩০ সালের রাশিয়া ভ্রমণ রবীন্দ্র-মনোলোকে যে 'প্রতিক্রিয়া' ও 'ভাবস্পন্দন' জন্মিয়েছিল তারই পটভূমিতে আবু জাফর কালের যাত্রাকে দেখবার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি মনে করেন ভারতীয় বর্ণাশ্রমিক জীবনের নিষ্ঠুরতা রুশীয় সাম্যবাদী চেতনার সংস্পর্শে নতুন তাৎপর্য লাভ করেছে। কিন্তু সমস্যা এই যে কবি মনে সাম্যবাদী ধারণা যে নতুন নয় তা প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদে স্বয়ং লেখকই দেখিয়েছেন—১৮৯৪ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যে

সাম্যবাদী চেতনার তাৎপর্যপূর্ণ উপস্থিতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তিনি রবীন্দ্রনাথের সাম্যবাদী চেতনার স্বরূপ অনুসন্ধান করতে গিয়ে কবির বক্তব্য ও জীবনাচরণে বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করেছেন। তাঁর অভিযোগ হলো, 'জীবনের কঠিন বাস্তবতা থেকে' তিনি দূরে রয়েছেন। আবু জাফর রবীন্দ্র-সাম্যবাদকে বলেছেন 'উদার মানবিকতা' শ্রেণী সংগ্রামের রূপ বা মার্কস-লেনিনের সাম্যবাদ থেকে তা স্বতন্ত্র।

আবু জাফর রচিত 'রবীন্দ্রনাথের সাম্যবাদী চিন্তার স্বরূপ ও তাঁর কালের যাত্রা' নামের এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকাতেও। আসলে দুই পত্রিকায় একই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্য পত্রিকায় (১৩৮১ সালে) প্রকাশের পর একাডেমী পত্রিকায় (১৩৮৩ সালে) দু'বছর পর একই প্রবন্ধ প্রকাশ দৃষ্টিকটু।

১৩৮২ থেকে '৮৪ এই তিন বছর বন্ধ থাকার পর প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের সম্পাদনায় প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হয়েছে। বিগত ২২/১ এবং ২৩/১ সংখ্যায় সৈয়দ আকরম হোসেনের 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসচিন্তা' এবং 'রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চতুরঙ্গ' প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমোক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-ভাবনা বা উপন্যাসের নির্মাণকলা প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। লেখক রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-ভাবনাগুলোকে মোট ১১টি সূত্রে উপস্থাপিত করেছেন। উপন্যাসের তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে রবীন্দ্র-উপন্যাসভাবনা অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। 'সচেতন শিল্পচিন্তার' অধিকারী 'ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের মুখ্য উদ্দেশ্য দেশ, সমাজ ও সময়শাসিত চরিত্রসমূহের অন্তস্তল উন্মোচন করা'।...৩৩

পরবর্তী প্রবন্ধে ডক্টর আকরম হোসেন রবীন্দ্র-উপন্যাসভাবনার কষ্টিপাথরে 'চতুরঙ্গ'-কে যাচাই করেছেন। তিনি এখানে 'চতুরঙ্গে'র নির্মাণকলা এবং জীবনার্থবোধের ব্যাপক বিশ্লেষণ করেছেন। প্রবন্ধ দুটির মধ্যে একদিকে গবেষণা-চেতনা, অন্যদিকে গদ্যশৈলীর ব্যক্তিত্ব মণ্ডিত অভিনবত্ব প্রদর্শন লক্ষ্য করা যায়।

সন্‌জীদা খাতুনের 'রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গীত রূপান্তর' (২২।২) রবীন্দ্র-সাহিত্যের আলোচনায় একটি মৌলিক দিক-নির্দেশ। কবিতাকে গানে রূপান্তরিত করবার সময় রবীন্দ্রনাথ 'শিল্পের ভাব ও আঙ্গিকের অবিচ্ছেদ্যতার তত্ত্বকে গ্রাহ্য' করেন নি—' এই রূপান্তর বাস্তবিক আধেয় বিষয়ে কি পরিবর্তন আনছে, তাতে উন্নতি বা অবনতি ঘটছে কিনা, অথবা তার ফল একই থাকছে কিম্বা সম্পূর্ণ নতুন সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে, এ পরিবর্তনের প্রয়োজনই বা বোধ করা হচ্ছে কেন' লেখিকা এ-সব বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও সঙ্গীতের এই বিচারে লক্ষ্য করা যায় যেমন অসাধারণ শ্রম ও অনুসন্ধিৎসা তেমনি মৌলিক-দৃষ্টিভঙ্গি।

সাহিত্য পত্রিকার ত্রয়োবিংশ বৎসরের (১৩৬৪-১৩৮৬) ইতিহাস আমাদের সাহিত্যে সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাল। এই সময়ে নানা প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করে সে রবীন্দ্রচর্চার যে ঐতিহ্য নির্মাণ করেছে তা অবশ্যি মহান গৌরবদীপ্ত। ধর্মীয় গোঁড়ামী বা রাজনৈতিক বিতর্ককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সাহিত্য-শিল্পের ঐতিহ্যের প্রতি সে থেকেছে অনবচ্ছিন্ন উৎসর্গীত। রবীন্দ্রকাব্য, উপন্যাস, সঙ্গীত, নাটক, প্রবন্ধ—তাঁর সমাজ-ভাবনা, শিল্পচেতনা ও মণ্ডনকলা বিষয়ে 'সাহিত্য পত্রিকা' যে আলোচনা গবেষণা চালিয়ে গেছে তা আমাদের সাহিত্যকে দান করেছে নতুন ঐশ্বর্য, অভিসারী করে তুলেছে নতুন পথের।

পরিশিষ্ট

সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্র-বিষয়ক প্রবন্ধের তালিকা :

১ রবীন্দ্রনাথের উত্তরকাব্য : শিশির ঘোষ, বর্ষা ১৩৬৭, ৪/১
২ রবীন্দ্রনাথের ছড়ার সংগ্রহ : আশুতোষ ভট্টাচার্য, বর্ষা ১৩৬৮, ৫/১
৩ ইয়েটস্ ও রবীন্দ্রনাথ : সারওয়ার মুরশিদ ,,
৪ ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ : মুহম্মদ আবদুল হাই ,,
৫ রবীন্দ্রসাহিত্যে রহস্যবাদ : হরেন্দ্রচন্দ্র পাল, বর্ষা ১৩৭৪, ১১/১
৬ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : দেশকাল ও শিল্পরূপ : সৈয়দ আকরম হোসেন, শীত ১৩৭৫, ১২/২
৭ রবীন্দ্রকাব্যে উপমা-রূপক ও প্রতীক : আহমদ কবির, বর্ষা ১৩৭৬, ১৩/১
৮ ঐ : আহমদ কবির, শীত ১৩৭৬, ১৩/২
৯ রবীন্দ্রনাথের কৌতুক নাটক : মাহমুদা খাতুন, শীত ১৩৮০, ১৭/২
১০ রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বঙ্গদর্শন : অমিত্রসূদন ভট্টচার্য, ঐ
১১ রবীন্দ্রনাথের সাম্যবাদী চিন্তার স্বরূপ ও তাঁর কালের যাত্রা : আবু জাফর, বর্ষা ১৩৮১, ১৮/১
১২ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসচিন্তা : সৈয়দ আকরম হোসেন, শীত ১৩৮৫, ২২/১
১৩ রবীন্দ্রনাথের কবিতার সঙ্গীত রূপান্তর : সন্‌জীদা খাতুন, বর্ষা ১৩৮৬, ২২/২
১৪ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চতুরঙ্গ : সৈয়দ আকরম হোসেন, শীত ১৩৮৬, ২৩/১

তথ্য-সংকেত

১ সাহিত্য পত্রিকা, ১ম সংখ্যা, বর্ষা ১৩৬৪ জ্ঞাতব্য দ্র.
২ প্রথম সংখ্যার সূচী—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : বৌদ্ধগানের ভাষা / মুহম্মদ আবদুল হাই : বাংলার ব্যঞ্জন-ধ্বনি / কাজী দীন মুহম্মদ : পদ্মাবতী কাব্যে আলাওল / আশুতোষ ভট্টাচার্য : উনবিংশ শতাব্দীর একজন মুসলমান কবি / আহমদ শরীফ বিদ্যাসুন্দরের কবি দ্বিজ-শ্রীধর কবিরাজ ও সাবিরিদ খান / অজিতকুমার গুহ : রূপ প্রতীকের ধারা / গ্রন্থপরিচয় : সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ও মুহম্মদ আবদুল হাই।
৩ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা, ঢা. বি. ১৯৭৮, পৃ. ১৬৭
৪ সাহিত্য পত্রিকা, শীত ১৩৬৪, ২য় সংখ্যা, চিঠিপত্র ও মতামত দ্র.
৫ বাংলা সাহিত্যে উচ্চতর গবেষণা, পৃ. ১৭৫
৬ বর্তমান নিবন্ধকারের সঙ্গে বাচনিক আলাপ : ১৪ জুন, ১৯৮০
৭ রাজশেখর বসু : চলন্তিকা, ৮ম সং, কলকাতা ১৩৬২, পৃ. ৮৭
'কিংবদন্তী, বিশ্রুতি, পরম্পরাগত উপদেশ বাক্য, ঐতিহাসিক কথা।'
৮ Eliot, T. S. : Selected Essays, ed. 1951, London, P. 14
৯ আজহারউদ্দীন খান : বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ আবদুল হাই, ঢাকা ১৯৭৬, পৃ. ৮৬
১০ গোলাম মুরশিদ : বিভাগোত্তর পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা, বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৮০, ১৮ : ৩, পৃ. ৩৪
১১ সংবাদ, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, ৯ মে, ১৯৬১
১২ The Daily Pakistan Observer, 9 May 1961, P. 8
১৩ Ibid, 25 June 1967
১৪ Ibid, 11 May 1967
১৫ বাংলা সাহিত্যে মুহম্মদ আবদুল হাই, পৃ. ১৯
১৬ সাহিত্য পত্রিকা, চতুর্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বর্ষা, ১৩৬৭, পৃ. ৩৭-৬৭

১৭ তদেব, পৃ. ৫২
১৮ তদেব, পৃ. ৬৪
১৯ তদেব, পৃ. ৬৯
২০ বাংলা একাডেমী পত্রিকা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১
২১ সাহিত্য পত্রিকা, বর্ষা ১৩৬৮, পৃ. ৩৮
২২ তদেব, পৃ. ৩৮-৩৯
২৩ তদেব, পৃ. ৪১
২৪ তদেব, পৃ. ৪৫
২৫ তদেব, পৃ. ৬৯
২৬ তদেব, পৃ. ৭২
২৭ সাহিত্য পত্রিকা ১১/১, পৃ. ২
২৮ তদেব, পৃ. ৮১
২৯ তদেব, পৃ. ১০৬
৩০ তদেব, ১৩/১, পৃ. ১১৬
৩১ তদেব, ১৭/২, পৃ. ৪৪
৩২ বাংলা একাডেমী গবেষণা পত্রিকা, ২১ : ২-৩, শ্রাবণ-পৌষ ১৩৮৩, পৃ. ১০১-১৪
৩৩ সাহিত্য পত্রিকা, ২২/১, পৃ. ৫৪